মেহেরপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

অর্থের অভাবে চোখের চিকিৎসা করাতে না পারা দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে মেহেরপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আদ্-দ্বীন চক্ষু হাসপাতাল, মেহেরপুর সদর শাখার উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সাইটসেভার্সের সহযোগিতায় সোমবার (১৭ আগস্ট) এ চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

ক্যাম্পে মোট ২৫৬ জন রোগীকে চক্ষু চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ছানি শনাক্ত হওয়া ৬৬ জন রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, দরিদ্র, অসহায়, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিধবা নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে এ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে। অর্থের অভাবে যারা দীর্ঘদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন, তাদের জন্য এ ক্যাম্পটি চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার একটি সুযোগ তৈরি করেছে।

চিকিৎসাসেবা নিতে আসা রোগীদের অনেকেই জানান, অর্থের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে চোখের চিকিৎসা করাতে পারেননি তারা। বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ছানি অপারেশনের সুযোগ পাওয়ায় তারা স্বস্তি প্রকাশ করেন।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন, কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বয়স্ক ও দরিদ্র মানুষের জন্য ছানি অপারেশনের মতো চিকিৎসা অনেক সময় ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের বিনামূল্যের চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে চক্ষু চিকিৎসাসেবা

পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

একটি অপারেশন শুধু একজন মানুষের চোখের আলোই ফিরিয়ে দেয় না, ফিরিয়ে দিতে পারে তার স্বাভাবিক জীবন, কর্মক্ষমতা এবং পরিবারের মুখে হাসিও।

মেহেরপুর বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই একমাত্র উপার্জনের জায়গা

মেহেরপুর বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি মুদি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় ৮৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক। আগুনে একটি বৃহৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনের অবলম্বনও হারিয়ে গেছে।

সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে বড়বাজার কাঁচাবাজারে অবস্থিত মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্সের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

আগুনে দোকানে থাকা মুদি মালামাল, সয়াবিন ও পামওয়েল, চাল, ডাল, মসলা ও বিভিন্ন পণ্যসহ প্রায় সব মালামাল পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয়রা জানান, আগুনের ধোঁয়া বাজার এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বড়বাজার ও কাঁচাবাজারের নৈশপ্রহরী এবং বড়বাজার মোড়ের বাসিন্দারা বিষয়টি টের পান। পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুনের খবর দেন এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মোখলেছুর জামান শাহিনের ছোট ভাই শামিম কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘আমি মুদি পণ্যের পাইকারি ব্যবসা করি।

আনুমানিক রাত পৌনে ২টার দিকে শর্ট সার্কিট থেকে আমার দোকানে আগুন লাগে। এতে দোকানের সম্পূর্ণ মালামাল ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার প্রায় ৮৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ব্যাংক থেকে আমার ঋণও রয়েছে। এখন আমি ও আমার পরিবারের পথে বসার মতো অবস্থা। রাষ্ট্রের কাছে আমার আকুল আবেদন, ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।’

তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, ‘মেহেরপুর জেলার অর্ধেকেরও বেশি খুচরা মুদি ব্যবসায়ীকে মো. মোখলেছুর জামান শাহিন পাইকারি পণ্য সরবরাহ করেন। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের এমন ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।’

ধ্বংসযজ্ঞের দুই বছরেও সংস্কার হয়নি ভাস্কর্য ও স্থাপনা

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এখন নিজেই যেন ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর রাতের আঁধারে চালানো ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর সংস্কার।

২০২৫ সালে পূর্ণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে একদিকে নষ্ট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলো, অন্যদিকে পর্যটক কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন কমপ্লেক্সকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। সেদিনই পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

দর্শনার্থীরা বলছেন, মুজিবনগর শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। অথচ ধ্বংসস্তূপের বর্তমান চিত্র দেখে হতাশ তারা। দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে এর আগের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছিলেন, মুজিবনগরের ইতিহাস জাতির গর্ব, যা চিরকাল অম্লান থাকবে। ইতিহাস যাতে কোনোভাবে বিকৃত না হয়, সে জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

ওই অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আরও জানান, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের যেসব অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো পূর্ণ সংস্কার করা হবে।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির পরও পেরিয়ে গেছে এক বছরের বেশি সময়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ভাঙচুরের পর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর দৃশ্যমান সংস্কারকাজ শুরু হয়নি। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। তাদের প্রশ্ন, কবে সংস্কার হবে স্বাধীনতার এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলোর?

সংস্কার না হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে মুজিবনগরের পর্যটনেও। একসময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা আসতেন। বিশেষ করে ছুটির দিন ও জাতীয় দিবসগুলোতে কমপ্লেক্স এলাকায় থাকত মানুষের ব্যাপক ভিড়। এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। ভাঙাচোরা পরিবেশ দেখে অনেক পর্যটক হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পর্যটক কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কমপ্লেক্সের আশপাশের হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান ও বিভিন্ন ছোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা। ব্যবসায়ীরা জানান, আগে ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড়ে বেচাকেনা বাড়ত। এখন অনেক সময় দোকান খুলে বসে থাকলেও পর্যাপ্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না। এতে আয় কমে গেছে, অথচ দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতনসহ অন্যান্য খরচ আগের মতোই রয়েছে।

এক ব্যবসায়ী বলেন, মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটক কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব তাদের ব্যবসায় পড়েছে। দ্রুত সংস্কার করে দর্শনার্থীদের

জন্য পরিবেশ সুন্দর করা হলে পর্যটক বাড়বে এবং স্থানীয় ব্যবসাও ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করেন তিনি।

স্থানীয়দের মতে, মুজিবনগর কমপ্লেক্সকে শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখলে হবে না। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলো সংস্কারের পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার, আধুনিক তথ্যকেন্দ্র, উন্নত আলোকসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কমপ্লেক্সটি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আবারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে মুজিবনগর। এতে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে মুজিবনগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যটননির্ভর অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াবে।

সংস্কারের অগ্রগতি জানতে মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ফলে সংস্কারকাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা এ বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যে মুজিবনগরের আম্রকাননে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল, যে স্থান স্বাধীনতার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী, সেই মুজিবনগর আজ নিজেই বহন করছে ধ্বংসের ক্ষত। কয়েক দশকের নির্মাণ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক কমপ্লেক্স এখন সংস্কারের অপেক্ষায়।

প্রতিশ্রুতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অপেক্ষা শেষ হয়নি। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, আর অবহেলা নয়, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মুজিবনগরের হারানো সৌন্দর্য। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে না থাকে, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস জানার জীবন্ত পাঠশালা।

তবে সংস্কার নিয়ে আশার কথা জানিয়েছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। তিনি বলেন, ‘মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে এবং সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাও পাঠানো হয়েছে। নতুন অর্থবছরে

বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংস্কারকাজ শুরু হবে।’

অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধের আড়াই হাজার বছরের ধারাবাহিকতা

ভূমিকা
এক জাতির ইতিহাস কখনো একটিমাত্র মুহূর্তে গড়ে ওঠে না—তা তৈরি হয় বহু শতাব্দীর প্রতিরোধ, সংগ্রাম আর মাথা-না-নোয়ানোর ধারাবাহিকতায়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যে জনপদ বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারের বাহিনীকে থামিয়ে দিয়েছিল বলে কিংবদন্তি প্রচলিত, আর যে জাতি ১৯৭১ সালে একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে—এই দুইয়ের মাঝে একটি অদৃশ্য সুতো আছে। সেই সুতোর নাম প্রতিরোধের চেতনা, যা বাংলার মাটির প্রতিটি প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বার বার ফিরে এসেছে।

এই লেখায় আমি সেই ধারাবাহিকতার একটি সম্পূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি—প্রাচীন গঙ্গারিডাই থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলের সশস্ত্র ও কৃষক বিদ্রোহ, ভাষার জন্য রক্তদান, বিশ্বমঞ্চে বাঙালির নৈতিক সাহস, আর অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। পথে বাংলার বিভিন্ন জনপদের উদাহরণ আসবে, কিন্তু গল্পটা আসলে গোটা বাংলাদেশের—একটি জাতির অবিচ্ছিন্ন আত্মপরিচয়ের গল্প।

১. গঙ্গারিডাই: প্রতিরোধের প্রথম লিখিত স্মৃতি
খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের লেখায় উঠে আসে ‘গঙ্গারিডাই’ (Gangaridai) নামের এক শক্তিশালী জনপদের কথা। ডিওডোরাস সিকিউলাস, প্লিনি দ্য এল্ডার, কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস ও প্লুটার্কের বর্ণনায় এই জনপদ উঠে আসে গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত এক বিশাল ও সমরশক্তিতে ভীতিপ্রদ রাজ্য হিসেবে। এই শক্তির ভিত্তি ছিল মূলত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা—গঙ্গা-পদ্মা- ব্রহ্মপুত্রের উর্বর পলিমাটি এই অঞ্চলকে করে তুলেছিল শস্যশ্যামল, আর এই কৃষি-সমৃদ্ধিই একটি বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও বিপুল হস্তীবাহিনী পোষণের সামর্থ্য জুগিয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডার যখন পাঞ্জাবের বিয়াস নদীর তীরে পৌঁছান, তখন তাঁর দীর্ঘযুদ্ধে ক্লান্ত সেনাবাহিনী আর সামনে এগোতে অস্বীকার করে। ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী, এই অস্বীকৃতির একটি বড় কারণ ছিল পূর্বদিকের গঙ্গারিডাইয়ের বিপুল হস্তীবাহিনী ও সৈন্যশক্তির জনশ্রুতি। এখানে স্পষ্ট করা দরকার—আলেকজান্ডার প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটিতে পা রাখেননি, আর গঙ্গারিডাইয়ের সঠিক কেন্দ্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও মতভেদ রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট জনপদকে এর কেন্দ্র বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তবু এই কিংবদন্তির তাৎপর্য একটি জায়গায়—এটাই সম্ভবত বাংলার মাটিতে প্রতিরোধের প্রথম লিখিত স্মৃতি, যা প্রমাণ করে এই ব-দ্বীপের মানুষ বহিঃশক্তির সামনে কখনো সহজে নত হয়নি।

২. তিতুমীর ও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ: বাংলার প্রথম সশস্ত্র জাগরণ
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার সংগঠিত সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির ও সন্ন্যাসীদের এই আন্দোলন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব-শোষণ ও দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এটি ছিল কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগঠিত সশস্ত্র প্রতিরোধ।

এরপর ১৮৩১ সালে সৈয়দ মীর নিসার আলী, যিনি ইতিহাসে তিতুমীর নামে পরিচিত, চব্বিশ পরগনার নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশ ও কাদা দিয়ে গড়ে তোলেন বিখ্যাত ‘বাঁশের কেল্লা’। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচ হাজার অনুসারী নিয়ে গড়ে তোলা এই প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ কামানের সামনে টিকতে পারেনি—তিতুমীর ও তাঁর বহু সঙ্গী শহীদ হন। কিন্তু বাঁশের কেল্লা আজও বাংলার প্রতিরোধ-চেতনার একটি জীবন্ত প্রতীক হয়ে আছে, যা প্রমাণ করে দেয় নীল বিদ্রোহের আগেই বাংলার মানুষ সংগঠিত হয়ে অস্ত্র হাতে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখেছিল।

৩. নীল বিদ্রোহ: কৃষকের রক্তে লেখা প্রতিরোধ

১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ ছিল ঊনবিংশ শতকের বাংলার সবচেয়ে ব্যাপক কৃষক-জাগরণ। ব্রিটিশ নীলকরদের জোরপূর্বক নীলচাষ ও নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল যশোর, নদীয়া,

পাবনা, ফরিদপুর, খুলনাসহ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রতি বিঘা জমিতে নীলচাষে কৃষকের খরচ হতো প্রায় দশ টাকা, অথচ নীলকররা তার বিনিময়ে দিত মাত্র সাড়ে তিন টাকা—এই বৈষম্যই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সর্বত্র।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নদীয়ার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও পোড়াগাছা গ্রামের দিগম্বর বিশ্বাস, যাঁদের সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনেই দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন যুগান্তকারী নাটক ‘নীল দর্পণ’—যা পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজি অনুবাদে (Nil Darpan, ১৮৬১) আন্তর্জাতিক পরিসরেও কৃষক-নিপীড়নের সাক্ষ্য বহন করেছিল।

এই একই সময়ে কুষ্টিয়ার মিরপুর অঞ্চলের প্যারীসুন্দরী দেবীর সংগ্রাম এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। জমিদার রামানন্দ সিংহের কনিষ্ঠ কন্যা হয়েও তিনি বিলাসী জমিদারি জীবনের আরাম ছেড়ে সরাসরি মাঠে নেমেছিলেন প্রজাদের পাশে। নিজের লাঠিয়াল বাহিনী সংগঠিত করে তিনি অত্যাচারী নীলকর টমাস আইভান কেনির বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকদের একত্র করেছিলেন এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নীলকরদের প্রতিরোধ করেছিলেন—একজন জমিদার-কন্যার পক্ষে সেকালে যা ছিল অভাবনীয় সাহসিকতা। তাঁর এই ব্যতিক্রমী নেতৃত্ব প্রমাণ করে, প্রতিরোধের চেতনা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা লিঙ্গের সীমায় আবদ্ধ ছিল না—আর বাংলার আনাচে-কানাচে তখন প্যারীসুন্দরীর মতো আরও অনেক সংগ্রামী পুরুষ ও নারী, প্রতিরোধের কারিগর নিজ নিজ অঞ্চলে এই একই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই বিদ্রোহে কেবল কৃষকরাই নয়, শিক্ষিত বাঙালি সমাজও পাশে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়সহ বহু লেখক-বুদ্ধিজীবী কলমের মাধ্যমে এই সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এটাই প্রমাণ করে, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধ ছিল বিক্ষিপ্ত নয়, বরং কৃষক ও শিক্ষিত সমাজের এক ব্যাপক ও সংযুক্ত জাগরণ।

৪. ভাষা আন্দোলন ১৯৫২: মাতৃভাষার জন্য রক্তদান
বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে বাংলার প্রতিরোধ-চেতনা নতুন রূপ নেয়—এবার তা রূপ নেয় নিজের মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে আসে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রদের

ওপর পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে।

এই আত্মত্যাগের তাৎপর্য কেবল ভাষার সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি—এটি প্রমাণ করেছিল, বাঙালির প্রতিরোধ কেবল ভূমি বা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেই নয়, নিজের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় রক্ষার জন্যও সমান তীব্র। ভাষা আন্দোলনই পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

৫. বিশ্বমঞ্চে বাঙালির নৈতিক সাহস
প্রতিরোধ সবসময় অস্ত্র দিয়ে হয় না—কখনো কখনো তা হয় একা দাঁড়িয়ে সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার সাহস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী টোকিও ট্রায়ালে ১১ জন বিচারকের মধ্যে একমাত্র কুষ্টিয়ার সন্তান বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল (১৮৮৬-১৯৬৭) আন্তর্জাতিক আইনের যুক্তিতে প্রতিহিংসামূলক বিচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। গোটা বিশ্ব যখন প্রতিশোধের চেতনায় মত্ত, তখন মিত্রশক্তি জাপানের ওপর যে বিপুল ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির বোঝা চাপাতে চেয়েছিল, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ভিন্নমতই তা অনেকাংশে ঠেকিয়ে দেয়।

এই একজন বাঙালি বিচারকের নিরপেক্ষ অবস্থান জাপানের ইতিহাসে এমন গভীর দাগ রেখে গেছে যে, তা আজও দুই দেশের সম্পর্কের একটি জীবন্ত ভিত্তি হয়ে আছে। টোকিওর ইয়াসুকুনি স্মৃতিসৌধে—যেখানে সাধারণত কেবল যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়—রাধাবিনোদ পালের জন্য একটি ব্যতিক্রমী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে, যদিও তিনি কোনো যুদ্ধে প্রাণ হারাননি। সম্রাট হিরোহিতো তাঁকে ভূষিত করেছিলেন জাপানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘কোক্কা কুনশোও’ পদকে। টোকিও ও কিয়োটো শহরে আজও তাঁর নামে রাজপথ ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে, কিয়োটোতে আছে তাঁকে নিয়ে একটি জাদুঘর, আর জাপানি পাঠ্যপুস্তকেও তাঁর নাম ও অবদানের কথা পড়ানো হয়। বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় বারবার উঠে আসে এই সত্য—জাপান আজ বাংলাদেশকে যে আন্তরিক বন্ধুত্বের চোখে দেখে, তার একটি বড় ভিত্তি এই কুষ্টিয়ার সন্তানের সেই একক সাহসী রায়। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে নিজের দেশেই রাধাবিনোদ পালের এই অবদান যতটা পরিচিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়।

এই একই ধারার আরেক দিক মরমী সাধক লালন শাহের জাত-পাতহীন, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানবতাবাদী দর্শন, যা বাংলার সাংস্কৃতিক

প্রতিরোধেরই একটি রূপ। সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন কিংবা সাংবাদিকতার অগ্রদূত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের মতো ব্যক্তিত্বরাও প্রমাণ করেছেন, কলম হতে পারে অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী প্রতিরোধের হাতিয়ার।

৬. ১৯৭১: সমগ্র জাতির চূড়ান্ত প্রতিরোধ
এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় নিঃসন্দেহে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এটি কোনো একক জেলা বা অঞ্চলের সংগ্রাম ছিল না—চট্টগ্রাম থেকে রংপুর, সিলেট থেকে খুলনা, সারাদেশের প্রতিটি জনপদ এই প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল। কুষ্টিয়ার মজমপুর গেট থেকে যশোরের চৌগাছা, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থেকে ঢাকার রাজপথ—প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিরোধ মিলেই তৈরি হয়েছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আত্মত্যাগ আসলে হাজার বছরের সেই একই চেতনার সর্বোচ্চ প্রকাশ—যে চেতনা কখনো বহিঃশক্তির সামনে মাথা নত করতে শেখায়নি।

উপসংহার: এক জাতির অবিচ্ছিন্ন চেতনা
গঙ্গারিডাইয়ের কিংবদন্তি থেকে ফকির-সন্ন্যাসী ও তিতুমীরের সশস্ত্র বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহের কৃষক-সংগ্রাম থেকে ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত আত্মত্যাগ, রাধাবিনোদ পালের নৈতিক সাহস থেকে ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ—এই প্রতিটি অধ্যায় ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন অঞ্চলে ঘটলেও এদের মূলে একটিই সুর: বাংলার মানুষ শোষণ ও পরাধীনতার কাছে কখনো স্থায়ীভাবে মাথা নত করেনি। এই ইতিহাস কোনো একটি জেলার একক গৌরব নয়, এটি সমগ্র জাতির অভিন্ন উত্তরাধিকার।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রম ও গণমাধ্যমে এই ধারাবাহিকতার কথা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। আমরা প্রায়ই ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন টুকরো হিসেবে শিখি—কখনো গঙ্গারিডাই নিয়ে, কখনো তিতুমীর নিয়ে, কখনো ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে—কিন্তু এই টুকরোগুলোকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা কমই হয়। অথচ এই ধারাবাহিকতা বোঝাই আমাদের জাতীয় পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে।

আসুন, আমরা আমাদের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নয়, বরং একটি অবিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের ধারা হিসেবে দেখি—যে ধারার শুরু হয়তো হারিয়ে যাওয়া গঙ্গারিডাইয়ে, কিন্তু যার প্রবাহ আজও বহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি স্পন্দনে।

গঙ্গারিডাই: প্রাচীন বাংলার বিস্মৃত শৌর্য ও সমৃদ্ধির ইতিহাস

ভূমিকা
আমি গর্বের সঙ্গে বলি, আমার বাড়ি কুষ্টিয়ায়—গঙ্গা ও পদ্মার পলিমাখা সেই জনপদে, যা প্রাচীন বাংলার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নীরব সাক্ষী।

আজ আমরা যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, তা কোনো সাধারণ ভূমি নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, এই অঞ্চল একদিন ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যশালী জনপদ ‘গঙ্গারিডাই’-এর অংশ—গ্রিক ও রোমান সূত্রে যাকে বলা হয়েছে Gangaridai বা Gangaridae। ধুলো ঝেড়ে সেই ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা এমন এক বাংলার সন্ধান পাই, যা কেবল সামরিক শক্তিতে নয়, বরং অর্থনীতি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতেও ছিল যুগের চেয়ে অগ্রগামী।

আজকের এই লেখায় আমি চেষ্টা করেছি প্রাচীন গ্রিক-রোমান সূত্র, ভারতীয় সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের আলোকে গঙ্গারিডাইয়ের ইতিহাস তুলে ধরতে—সেইসঙ্গে এই ইতিহাস ঘিরে যে বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা এখনো রয়ে গেছে, তারও উল্লেখ করতে।
প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গারিডাইয়ের উল্লেখ

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রথম উঠে আসে ‘গঙ্গারিডাই’ নামের এক শক্তিশালী জনপদের কথা।

ডিওডোরাস সিকিউলাস, প্লিনি দ্য এল্ডার, কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস এবং প্লুটার্ক—এই ঐতিহাসিকরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রচনায় এই জনপদের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় গঙ্গারিডাই উঠে আসে গঙ্গা নদীর নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত এক বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে, যার

সামরিক শক্তি ছিল ভীতি জাগানোর মতো।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এই অঞ্চলের ছায়া পাওয়া যায়। মহাভারতে ‘বঙ্গ’ নামের একটি শক্তিশালী জনপদের উল্লেখ আছে, আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও গাঙ্গেয় অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা এসেছে। তবে এটি মনে রাখা জরুরি যে এসব সাহিত্যিক সূত্র সরাসরি ‘গঙ্গারিডাই’ নাম ব্যবহার করেনি; পণ্ডিতরা পরবর্তীকালে ভৌগোলিক ও প্রাসঙ্গিক মিল বিচার করে এই যোগসূত্র স্থাপন করেছেন।

আলেকজান্ডার ও গঙ্গারিডাইয়ের কিংবদন্তি

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার পারস্য ও আফগানিস্তান জয় করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের কিছু অঞ্চল জয়ের পর তিনি বিয়াস নদীর তীরে পৌঁছান, আর সেখানেই তাঁর দীর্ঘযুদ্ধে ক্লান্ত সৈন্যবাহিনী আর সামনে এগোতে অস্বীকার করে। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, এই বিদ্রোহের পেছনে একটি বড় কারণ ছিল পূর্বদিকে অবস্থিত গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্যের ভয়ংকর সামরিক শক্তির খবর।

ডিওডোরাস ও প্লুটার্কের বিবরণ অনুযায়ী, গঙ্গারিডাইয়ের ছিল বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষিত যুদ্ধ-হস্তী, বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী এবং লক্ষাধিক পদাতিক সৈন্য—সূত্রভেদে এই সংখ্যাগুলোতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, তাই আধুনিক ইতিহাসবিদরা এগুলোকে প্রাচীন লেখকদের অতিরঞ্জনসহ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পরামর্শ দেন।

তবে মূল কথা হলো, এই বিশাল সামরিক শক্তির জনশ্রুতিই আলেকজান্ডারের ক্লান্ত সেনাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন যুদ্ধরত থাকা এবং স্বদেশে ফেরার আকুতি ছিল তাদের অস্বীকৃতির আরেকটি বড় কারণ। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডার বাংলা অভিমুখে অগ্রসর না হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এখানে একটি ঐতিহাসিক সত্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন—আলেকজান্ডার প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটিতে কখনো পা রাখেননি; তিনি পাঞ্জাবের বিয়াস নদী পর্যন্তই পৌঁছেছিলেন। তবু গঙ্গারিডাইয়ের শক্তির খ্যাতি তাঁর অভিযানের গতিপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল, যা ইতিহাসের একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায় হিসেবে থেকে গেছে।

গঙ্গারিডাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান
গঙ্গারিডাইয়ের সঠিক ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, এই জনপদ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ অঞ্চল, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ মনে করেন এর কেন্দ্র ছিল আজকের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, যদিও এই অনুমান এখনো প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

প্লিনির বর্ণনায় গঙ্গারিডাইয়ের রাজধানীর নাম বলা হয়েছে ‘গঙ্গে’ (Gange)। কিছু গবেষক অনুমান করেন এটি বর্তমান মালদহ বা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে সঠিক অবস্থান আজও চিহ্নিত করা যায়নি। এই অনিশ্চয়তাই এই ইতিহাসকে আরও গবেষণার দাবিদার করে তোলে।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও কৃষি সমৃদ্ধি
গঙ্গারিডাইয়ের শক্তির মূল ভিত্তি ছিল তার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের উর্বর পলিমাটি এই অঞ্চলকে করে তুলেছিল শস্যশ্যামল ও প্রাণবন্ত। প্রাচীন গ্রিক লেখকদের বিবরণ অনুযায়ী এখানে বছরে একাধিকবার প্রচুর ফসল ফলত, ফলে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না বললেই চলে। এই কৃষি-সমৃদ্ধিই তাদের একটি বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও হস্তীবাহিনী লালন-পালনের সামর্থ্য জুগিয়েছিল।

কৃষির পাশাপাশি পশুপালন, মৎস্য আহরণ ও কুটিরশিল্পও এই অঞ্চলে উন্নত ছিল, বিশেষত তাঁত শিল্প ছিল সূক্ষ্ম ও সমাদৃত।
বাণিজ্য ও শিল্পে গঙ্গারিডাই

গঙ্গারিডাই কেবল কৃষিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রও। নৌপথে এই অঞ্চলের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। গঙ্গা নদী ছিল তাদের প্রধান বাণিজ্যপথ, যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঞ্চলে পণ্য পরিবহন হতো।

এই অঞ্চলের সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র—যা পরবর্তীকালে মসলিন নামে জগৎবিখ্যাত হয়ে ওঠে—রপ্তানি হতো রোমান সাম্রাজ্যসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এর সঙ্গে মসলা, রেশম, হাতির দাঁত এবং মূল্যবান রত্নও রপ্তানির তালিকায় ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে জাহাজে করে পণ্য যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আরব উপদ্বীপ ও পূর্ব আফ্রিকায়।

প্লিনি তাঁর ‘Naturalis Historia’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গারিডাই থেকে উৎকৃষ্ট মানের মুক্তা ও সূক্ষ্ম বস্ত্র রোমে আমদানি হতো। এসব পণ্যের বিনিময়ে রোমান স্বর্ণমুদ্রা এই অঞ্চলে প্রবাহিত হতো, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করেছিল।
সামরিক শক্তি ও যুদ্ধকৌশল

গঙ্গারিডাইয়ের সামরিক শক্তির সবচেয়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্য ছিল তার বিশাল হস্তীবাহিনী। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধকৌশলে হাতি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় গঙ্গারিডাইয়ের হস্তীবাহিনীর যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের যেকোনো রাজ্যের তুলনায় বিস্ময়কর রকম বেশি। আলেকজান্ডার ভারতে আসার আগে পারস্যে সীমিতসংখ্যক হাতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, আর সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর সৈন্যদের মনে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। গঙ্গারিডাইয়ের বিপুল হস্তীবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা তাদের কাছে ছিল প্রায় দুঃস্বপ্নতুল্য।

এর পাশাপাশি গঙ্গারিডাইয়ের ছিল সুসংগঠিত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌবাহিনীর গুরুত্বও ছিল অপরিসীম, এবং নৌযুদ্ধেও তাদের দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়।
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন

গঙ্গারিডাই শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল না, সাংস্কৃতিকভাবেও ছিল যথেষ্ট বিকশিত। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও বঙ্গ অঞ্চলের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির কথা উঠে এসেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, মুদ্রা ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, এখানে একটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, তাম্রলিপ্ত ও পুণ্ড্রবর্ধন ছিল সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলেই গড়ে ওঠে পাহাড়পুর ও সোমপুর বিহারের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা প্রমাণ করে জ্ঞানচর্চার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য এই ভূমিতে বহু আগে থেকেই প্রোথিত ছিল।

ঐতিহাসিক বিতর্ক ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা
গঙ্গারিডাই নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত। এর সঠিক সীমানা, শাসক রাজবংশের পরিচয়, রাজধানীর প্রকৃত অবস্থান—এসব বিষয়ে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা জরুরি। কোনো কোনো

ঐতিহাসিক মনে করেন গঙ্গারিডাই ছিল নন্দ বংশের অধীনস্থ একটি শক্তিশালী মহাজনপদ, আবার অনেকের মতে এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য। এই বিতর্ক এখনো নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে, আর সেটিই প্রমাণ করে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস কতটা গবেষণার দাবি রাখে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রমে এই গৌরবময় অধ্যায় খুব কমই স্থান পেয়েছে। আমরা দূরদেশের বীরদের কাহিনি শিখি বিস্তারিতভাবে, অথচ নিজেদের শেকড়ের এই শৌর্যগাথা রয়ে যায় প্রায় অজানা।

উপসংহার

গঙ্গারিডাই ছিল প্রাচীন বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জনপদ। এর সামরিক খ্যাতি বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রায় মনস্তাত্ত্বিক বাধা তৈরি করেছিল। এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, আর এর সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ পরবর্তী বাংলার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

আমরা যারা গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার বাসিন্দা, আমরা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যেরই একটি অংশের উত্তরাধিকারী। আমাদের দায়িত্ব এই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য গবেষণার মাধ্যমে এর অজানা অধ্যায়গুলো উন্মোচন করা, এবং জাতীয় ঐতিহ্যের এই উৎসকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষণ করা।

আসুন, আমরা আমাদের শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং জেনে নিই—আমাদের এই মাটি এমন এক সভ্যতার সাক্ষী, যা একদিন জ্ঞান, সম্পদ ও শৌর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আনোয়ার হোসেন র্যাফেল
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

মেহেরপুরে গোভীপুরে অগ্নিকাণ্ডে চার ছাগলের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

রোববার মধ্যরাতে সদর উপজেলার গোভীপুর দক্ষিণপাড়ায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোভীপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মোহর আলীর ছেলে মোরসালিন তাঁর গোয়ালঘরে একটি মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখেন। ওই মশার কয়েল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তবে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পৌঁছানোর আগেই গোয়ালঘরটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ সময় গোয়ালঘরে বাঁধা চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়।

অগ্নিকাণ্ডে গোয়ালঘরসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য পক্ষের উদ্ধোধন

জাতীয় মৎস্য পক্ষ উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে

র্যালিটি শুরু হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র্যালিটি বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদার, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় মৎস্য পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এরপর সদর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়।

মাদার তেরেসা পিস অ্যাওয়ার্ড পেলেন শুকুর আলী

মাদার তেরেসা পিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ পেয়েছেন বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মো. শুকুর আলী।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি এ পুরস্কারে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে

জড়িত। তিনি বহুমাত্রিক মেহেরপুর জেলা শাখার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া প্রথম আলো বন্ধুসভা, মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য, মুজিবনগর সামাজিক সংস্থার কোষাধ্যক্ষ এবং চকশ্যামনগর ব্লাড ব্যাংক, মেহেরপুরের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষক সংগঠনের কর্মকাণ্ডেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি, মেহেরপুর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক।

পাশাপাশি মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালক হিসেবে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এর আগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক (মাদ্রাসা) নির্বাচিত হন।

মাদার তেরেসা পিস অ্যাওয়ার্ডের জন্য তাঁকে মনোনীত করায় তিনি মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিলের মহাসচিব, কার্যনির্বাহী পরিষদ, উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং চকশ্যামনগর গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বোমা সদৃশ ঝুলন্ত বস্তু নিয়ে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ার ঘটনায় প্রেস ব্রিফিং করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন।

শনিবার (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে

বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বস্তুটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে উপাচার্যের নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সেকশন অফিসার (পিএস টু ভিসি) ড. তারিক আজিজকে।

সদস্য হিসেবে রয়েছেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবু সাঈদ ও সেকশন অফিসার কাজী মইনুল হক।

কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন উপাচার্যের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা যাতে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সার্চলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কর্তব্যরত নৈশপ্রহরীকে সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষে দুটি বিষয় চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। যেকোনো অন্যায়, নৈরাজ্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে বিএটিবির আউটসোর্সিং কর্মীদের

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

ঠিকাদারি ও আউটসোর্সিং প্রথা বিলুপ্ত করে চাকরি স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের সুরক্ষার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতীকী অনশন করেছেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও কর্মচারীরা।

অনতিবিলম্বে এসব দাবি মেনে নেওয়া না হলে দেশের সব তামাক অঞ্চলে সব ধরনের কাজ বন্ধ করে দেওয়াসহ কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাসপোর্ট কার্যালয়সংলগ্ন বিএটিবি কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএটিবি ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও অফিস স্টাফ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে কুষ্টিয়ার চেচুয়া, আল্লার দরগা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুরসহ চারটি তামাক অঞ্চলের শতাধিক মাঠকর্মী ও কার্যালয়কর্মী অংশ নেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা তামাকচাষিদের তালিকা প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন, বীজ ও সার বিতরণ, মাঠপর্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং কোম্পানির প্রযুক্তিগত কার্যক্রম পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছেন। অথচ তাঁদের ন্যূনতম চাকরির নিরাপত্তাও দেওয়া হচ্ছে না।

বক্তারা আরও বলেন, এই শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে সরাসরি স্থায়ী নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সামিউল ইসলাম, হাসিবুর রহমান, নাজমুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন ও মিলনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।